সংবাদ

তারিখ ...1-4 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫ ....

শিক্ষা নিয়ে কোন বাণিজ্য নয়

ইউনুস রাজু

মাজকে সুস্থ করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। নেতেন শিক্ষা নয়; সুস্থ সমাজের পূর্বশর্ত হলো মানুষকে কৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা। স্বাধীনতার ৩৭ ছর পরেও আমরা যে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারিনি র কারণ আমাদের রোগাক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। মূল গলদটা খানেই। যদিও একাধিকবার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গলদমুক্ত রার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু কোন উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত স্তবতার আলো দেখেনি। কাজের কাজ কিছু না হলেও ক্ষা নিয়ে টানাহেঁচড়া হয়েছে বিস্তর। সংকীর্ণ দলীয় বা াষ্ঠী স্বার্থে শিক্ষাকে বিপথগামী করার চেষ্টাও কম হয়নি। বচেয়ে বেশি হয়েছে শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি ও লুটপাট। ক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশই চলে গেছে নীতিবাজদের পকেটে। শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট একটি ক্ষেত্রও খুঁজে াওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতি হয়নি। সবকিছুর যোগফল লো আজকের বিপন্ন বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা। যার কুফল ভোগ রতে হচ্ছে গোটা সমাজকে।

শিক্ষা বাজেটের অর্ধেকই ব্যয় হয় এমপিও খাতে। বিষয়টি নতে একটু খটকা লাগলেও এটাই বাস্তব। অনেক প্রতিষ্ঠানে ত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। শিক্ষা ক্ষেত্রে গত দেড় শকে এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) করা নিয়ে টেছে নজিরবিহীন অনেক কাণ্ড। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও দ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের তহবিল থেকে অনুদান নেয়া য়ে চলেছে রাজনীতি ও ব্যবসা। অবস্থা এমন হয়েছে যে, াট শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে এমপিওভুক্ত ক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের পেছনে। মাঠ পর্যায়ে এমন ত্রও দেখা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর য়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সরকারি কোষাগার থেকে ক্ষকদের বেতন-ভাতা নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

গত জুন মাসে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর কে আমরা জেনেছি যে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট রকারের আমলে প্রয়োজন না থাকলেও যেখানে-সেখানে নেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। জনসংখ্যার নত্ব, অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দূরত্ব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছুই বিবেচনা করা হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ছাত্র র্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ দানের অনুমতি, একাডেমিক ীকৃতি ও এমপিওভুক্তি সবই করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব ষ্ট করে। নিয়মনীতির কোন তোয়াক্কা করা হয়নি। শিক্ষা শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মতে, এমপিওভুক্ত করা নিয়ে ব কাণ্ড ঘটেছে তাতে কেবল জনগণের অর্থেরই অপচয় য়েছে। ফলাফল কিংবা মান কোনভাবেই বিবেচনায় আনা নি। এক হিসেবে দেখা যায়, শিক্ষা খাতের মোট রাজস্ব জেটের ৫২ শতাংশ যায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের তন-ভাতার পেছনে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে মপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পেছনে সরকারের ব্যয় য়েছে ৪ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা। আর আগামী অর্থবছরে ০০৮-২০০৯) এখাতে ৩ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ খা হয়েছে। গত দেড় বছরে নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মপিওভুক্ত করেনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এজন্য এক হাজার

থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা ২০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন। এজন্য বছরে ৫৮২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) নীতিমালা অনুযায়ী একজন বেসরকারি শিক্ষককে মূল বেতনের শতভাগ সরকার দিয়ে থাকে। নব্বই-এর দশকে একজন শিক্ষক মূল বেতনের ৬০ শতাংশ পেতেন। পর্যায়ক্রমে সরকারি অংশ বাড়িয়ে ২০০৬ সাল থেকে শতভাগ করা হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষককে মূল বেতনের পুরোটাই এবং বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা বাবদ আড়াই শ' টাকা সরকার দিয়ে থাকে। সর্বশেষ হিসাবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার লাখ ৭৩ হাজার ৮৮০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত হিসেবে সরকার বেতন-ভাতা দিচ্ছে।

১৯৯৫ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রথা পুরোপুরি শুরু হয়। তখনকার প্রণীত নীতিমালাতেই এখনও চলছে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার প্রক্রিয়া। কিন্তু রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময়ে এমপিওভুক্তি নিয়ে চলেছে স্বেচ্ছাচার। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি আট হাজার মানুষের জন্য একটি নিম্নমাধ্যমিক, দশ হাজার জনের বিপরীতে একটি মাধ্যমিক স্কুল ও ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি কলেজ এবং ২০ হাজার লোকের বিপরীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে। সে হিসেবে সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪ হাজার ২০০টি হবার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবে এখন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৩৭০টিতে। অর্থাৎ সরকারি হিসেবেই দুই হাজার এক শ'টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয় উদ্যোক্তাদের। এরপর তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঠদানের অনুমতি এবং তা সন্তোষজনক হলে একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এমপিওভুক্ত হলে একটি স্কুলের ৮ জন, কলেজ ও মাদ্রাসায় ১০ থেকে ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকার বেতন-ভাতা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নয়ন তালিকাভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৭, ২০০৪ ও ২০০৫ সাল এই তিনটি বছরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ তখন এত বেশি ছিল যে, বৃত্তি পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল না

পরে বহাল রাখা হয়। ঐ সময়ের ধারাবাহিকতায় এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির জন্য ১৫ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে আর কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত না করা।

সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশার কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে গত ১৮ ও ১৯ জুন ইত্তেফাকে প্রকাশিত দু'টি প্রতিবেদনে। এতে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা শিহরিত হওয়ার মতো। ক্ষমতাবানদের মর্জিমাফিক হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি অর্থে। শুধু দিনাজপুরেই এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪শ'র কাছাকাছি। আবার যেখানে প্রয়োজন সেখানে বছরের পর বছর ধরে বহু আবেদন-নিবেদন করেও কোন স্কুল হচ্ছে না। তদুপরি, ভুয়া স্কুল ও মাদ্রাসা এবং ভুয়া শিক্ষকের নামে প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা লুটে নেয়ার খবর কে না জানে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে এবং জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে গত ৬ বছরে সরকারি তহবিল থেকে অতিরিক্ত ১শ' ৬০ কোটি টাকার বেশি অর্থ লোপাট করে নিয়েছেন। আর অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত শিক্ষকদের পেছনে বছরে গচ্চা যাচ্ছে কমপক্ষে ৬শ' কোটি টাকা। এভাবে বেশ কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত খবর সিরাজগঞ্জে বিধিবহির্ভূতভাবে যত্রতত্র স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠায় শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানসম্মত শিক্ষা কিংবা পাঠদান চলুক আর নাই চলুক রাজনৈতিক নেতাদের আধিপত্য বিস্তার কিংবা বিত্তশালীদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কলেজগুলো ব্যবহার হচ্ছে। আর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্যের নামে ম্যানেজিং কমিটি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ঝিনাইদহ জেলায় এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজগুলোর শিক্ষকদের বেতন-ভাতার জন্য সরকারের বার্ষিক ৪০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। ১৯৯১ সালে ১টি সরকারি কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ১২টি। আর বর্তমানে এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩টি। নতুন স্থাপিত কলেজগুলোর মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক কলেজ রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থাপিত হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তিকরণ, নিয়ম ভঙ্গ করে কাছাকাছি দূরত্বে একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা কমিটির দৌরাত্ম্যে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও কোন্দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম করে অর্থ আত্মসাৎ

শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। নেত্রকোনা জেলা এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ২৬০। কয়ে বছরে কলেজ, মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এব মাদ্রাসার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার হার তেমন বাড়েনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে মামলা, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মামল রাজনৈতিক কারণে স্কুল নির্মাণ এবং স্কুল-কলেজ পরিচাল নিয়ে বিভিন্ন সময় সরকারের নীতির পরিবর্তনের কারণে স সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধ লেগেই আছে। এখন শতাধি স্কুলে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে মামলা চলছে। ফলে স্কুলে লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। নওগাঁ জেলায় জো সরকারের সময় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল-কলেজ সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে তাতে ব্যাপক দুর্নী হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রী ও এমপিদের প্রভাব ছিল। মন্ ও এমপিরা রাজনৈতিক বিবেচনা মাথায় রেখে নিজ নি নির্বাচনী এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক, পরিচালনা কমিটি প্রকল্প কমিটি সদস্যগণ পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেছেন, এসব প্রক থেকে মন্ত্রী-এমপি ছাড়াও কমিটিগুলোর লোকজন লাখ লা টাকা হাতিয়ে নেন। বাগেরহাট জেলায় জোট সরকারে আমলে ৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিওভুক্ত হয় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নি বা আত্মীয়-স্বজনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কক্সবাজা এমপিওভুক্ত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে কোন অডি করা হয় না। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়সারা গোছে অডিট করে কৌশলে আত্মসাৎ করছে লাখ লাখ টাকা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ও মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অনেক শিক্ষ প্রতিষ্ঠান নিয়ম বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছে। তৎকালী যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ তার নির্বাচ এলাকা নবগঠিত পেকুয়া উপজেলা ও চকরিয়া উপজেলা শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেন।

এ কথা সত্য যে, আমাদের সমস্যার কোন শেষ নেই তবে যে ক'টি সমস্যা আমাদের সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে তা শীর্ষে রয়েছে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি ও রাজনৈতি অসহিষ্ণুতা। নামে ভিন্ন হলেও এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় এরা একে অপরের পরিপূরক। কারণ এদের শেকড় অভি এবং তা ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজদেহের অনে গভীরে। তাই সবার আগে সমাজকে সুস্থ করা দরকার সমাজকে সুস্থ করা ছাড়া দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি ব রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার মতো গুরুতর সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে বেরিয়ে আসার বিকল্প বা শর্টকাট কোন পথ খোল নেই।

সুস্থ সমাজ গড়ার অন্যতম মূল ভিত্তি হলো সুস্থ শিক্ষ ব্যবস্থা। শিক্ষার মূল ভিত্তিটা হলো প্রাথমিক শিক্ষা। সু সমাজ বা সুস্থ শিক্ষা যাই বলি না কেন সবকিছুরই ভিত্তি হচ্ছে এই প্রাথমিক শিক্ষা। আমরা কেমন সমাজ চাই তার ভিত্তিপ্র রটি স্থাপিত হয় এখানেই। আমরা যদি একটি দুর্নীতিমুক্ত পরমতসহিষ্ণু গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে চাই তাহলে সেই কাজটি শুরু করতে হবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে উভয়কে ঘৃণাভ